মন্বন্তর-কবলিত গ্রাম-বাংলার চিত্র ঃ বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব

১৩৫০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মন্বন্তরের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত উপন্যাস বা নাটক রচিত হয়েছে বিভূতিভূষণের "অশনি-সংকেত" তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম-বাংলার যে করুণ অথচ বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে অন্যান্য রচনায় তা বিরলদৃষ্ট। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মন্বন্তর" উপন্যাসে প্রধানত নগর কলকাতার যুদ্ধ-আতঙ্কিত মানুষের ছবি আছে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকেও মহানগরী কলকাতার ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থের জৌলুস ও খাদ্য অপব্যয়ের পাশাপাশি অন্নহারা মানুষের খাদ্যের জন্য আর্ত হাহাকারের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে গ্রামের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের মোটামুটি সচ্ছল শান্ত জীবনে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কীভাবে এক শ্রেণীর মুনাফালোভী মানুষ কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছে এবং শেষে তা কীভাবে সর্বনাশা মন্বন্তরের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, তাই অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

তারাশঙ্কর বা বিজন ভট্টাচার্যের মত বিভূতিভূষণও মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী। কাছে থেকে দেখার জন্য দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর ছিল, তেমনি অভিজ্ঞতাকে শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত করে প্রকাশ করার মত সহৃদয়তা এবং দক্ষতাও তাঁর ছিল। বিভূতিভূষণ গ্রামীণ মানুষের এই অভাব, বিশেষ করে খাদ্যাভাবের চিত্র ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। এবং শেষে তা মৃত্যুতে ভীষণ ও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের প্রথমে লেখক গঙ্গাচরণের পারিবারিক জীবনের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে দরিদ্র মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নসুখকল্পনার কথা বলেছেন। গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী, তার স্ত্রী অনঙ্গ এবং দুই পুত্র পটল ও হাবুকে নিয়ে পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে বারবার বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন এবং শেষে নতুন

গাঁ-এর কাপালী ও গোয়ালাদের প্রতিবেশী হয়ে, বলা যায় একটু 'থিতু' হয়েছে। কিন্তু তার পরেই ঘটলো বিপর্যয়।

কামদেবপুর গ্রামে 'গাঁ বন্ধ' করতে গিয়ে গঙ্গাচরণ প্রথম শুনলো, চালের দাম খুব আক্রা হবে। কিন্তু কথাটায় গঙ্গাচরণ এবং অন্যান্যরা কেউ তেমন গুরুত্ব দিল না। ফেরার সময় গঙ্গাচরণ দীনু ভট্টচার্যের কাছেও শুনলে, চালের দাম হু হু করে বাড়ছে। গঙ্গাচরণ যুদ্ধের কথা শুনেছিল এবং মাথার উপর দিয়ে দু-একটা এরোপ্লেন উড়ে যেতেও দেখেছিল। কাজেই সে আর অবিশ্বাস করতে পারল না। আরও জানা গেল, জার্মানি আর জাপানের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজ-অধিকৃত সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। বিভূতিভূষণ লিখছেন, বৈশাখের মাঝামাঝি বাজারের আরও পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। চালের সঙ্গে কেরোসিনও আর মেলে না। নুনেরও অভাব হতে পারে। মানুষ এই প্রথম দেখল, পয়সা থাকলেও জিনিস জোটে না। এখানে বৈশাখ বলতে ১৩৫০ সালের বৈশাখ এবং ইংরাজী ১৯৪৩ সালের এপ্রিল-মে মাস। ঐতিহাসিকরাও এই সময়ে, অর্থাৎ মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মন্বন্তরের চরম অবস্থা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন।

এদিকে চালের দাম বাড়তে লাগল। চার টাকার চাল হল দশ টাকা মণ। এই সঙ্গে দেশলাইও উধাও। রাধিকানগরের বাজারে চাল কিনতে গিয়ে গঙ্গাচরণ পড়ল মহাবিপদে। পাঁচু কুণ্ডুর চালের দোকান লুঠ হল। গঙ্গাচরণ পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তে কোন রকমে রক্ষা পেল। এবং এই প্রথম চাল কিনতে গিয়ে শূন্য থলি হাতে বাড়ি ফিরল। এদিকে পাড়ার কোন প্রতিবেশীর কাছেও আর ধার মেলে না, সবাই ধার করতে চায়। এদিকে চিড়ের দামও বাড়তে লাগল; দু'আনা সেরের চিড়ে হল বারো আনা।

এই খাদ্যাভাবের কথা বলতে গিয়ে বিভূতিভূষণ কিন্তু কোথাও বলেননি যে, অজন্মার জন্য খাদ্যশস্যের অভাব ঘটেছে। তিনি জানিয়েছেন, অভাবের বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটা কারণ হল, ব্ল্যাক মার্কেটের ফলে বেশি দাম পেয়ে চাষী মজুত ধান বিক্রি করে দিয়েছিল। এ ছাড়া গঙ্গাচরণ দেখল, 'যে বাঁশের মাচায় চালের বস্তা ছাদ পর্যন্ত সাজানো থাকে, সে জায়গা একদম খালি, হাওয়া খেলচে।' আসল কথা, ব্যবসাদাররা মজুত খাদ্যশস্য অন্য নিরাপদ স্থানে পাচার করে দিয়েছিল। অর্থাৎ দেশে খাদ্য ছিল কিন্তু সুষম বণ্টন হয়নি এবং আরও বেশি লাভের লোভে মুদ্রার বিনিময়েও আড়তদাররা সাধারণ মানুষকে খাদ্য বিক্রি করতে চায়নি। অত্যধিক দাম যারা দিতে পেরেছিল, তারা অবশ্য কিছু কিছু পেয়েছিল। কাজেই বিভূতিভূষণের মতে এই মন্বন্তর মনুষ্য-সৃষ্ট। অমর্ত্য সেনের মত অর্থনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিকরা একথাই বলেছেন। তবে প্রধান না হলেও মন্বন্তরের আগের বৎসরের খাদ্য উৎপাদনে নানা কারণে ঘাটতিকেও কারণ হিসেবে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যাই হোক, চালের জন্য বেশি দাম জোগাতে থালাবাটি বন্ধক দেওয়া শুরু হল। সোনা দানা যা ছিল শুরু হল বিক্রি। অনঙ্গবৌ হাতের পেটি খুলে গঙ্গাচরণকে দিল বিক্রি করে পিতৃতুল্য দীনু ভট্চাযের জন্য চাল এনে দিতে। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি চালের অভাব তীব্র হয়ে উঠল, শেষের দিকে চাল যেন কর্পূরের মত উবে গেল। এর উপর শুরু হল ত্রিপুরা থেকে আগত জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার উদ্বাস্তু ভিখারীর ভিড়। তারা 'ফ্যান খাইতাম, ফ্যান খাইতাম' বলে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফ্যান চেয়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু চাল নেই তো

ক্যান কীভাবে মিলবে! লোকে চালের অভাবে কচুর ডাঁটা, গাছের শাকপাতা, পুকুরের গেঁড়ি-গুগলি খেতে লাগল। কেউ কেউ কলাইসিদ্ধ, বনের মেটে আলুসিদ্ধ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে লাগল। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত আর জুটল না।

কথায় বলে, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। এর মধ্যে একদিন কাপালী-বৌ যদু পোড়ার কাছে তার সতীত্ব বিক্রি করে এল। সে 'ইটখোলা থেকে বেরুলো, আঁচলে আধ পালি চাল।... অন্ধকার পথের দু'ধারে আসশেওড়া বনে জোনাকি জ্বলচে।' যেন—'পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!' 'কিন্তু পেটের জ্বালায় জ্বলে কাপালী-বৌ সতীত্ব হারালেও নারীত্ব হারায়নি। তার আধপালি চালের থেকে কিছু দিতে চেয়ে অনঙ্গকে সে বলেছে, 'পায়ে পড়ি বামুন-দিদি। নাও দুটো চাল তুমি—' তারপর বলেছে—'তুমি সতীলক্ষ্মী, পায়ের ধুলো দিও—নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতি পাই—'। অন্নহারা মানুষের যে মর্মান্তিক চিত্র বিভূতিভূষণ এখানে রূপায়িত করেছেন, তাতে আমরা অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে কাপালী-বৌ কিছুটা পরাজিত হলেও অনঙ্গর প্রেরণায় শেষ পর্যন্ত সে জয়ী হয়েছে। বিভূতিভূষণ গভীর সহৃদয়তার সঙ্গে আর একটি নারীর ছবি এঁকেছেন, তা হল নিবারণ ঘোষের বিধবা বড় মেয়ে ক্ষ্যান্তমণির। সে তার বাবার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গঙ্গাচরণকে এনে দিয়েছে আধ পালিটাক চাল বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য। ভোজন করতে বসে বাড়িতে অভুক্ত স্ত্রী-পুত্রের কথা ভেবে গঙ্গাচরণের গলা দিয়ে যে ভাত নামছিল না, তা সে মরমী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ করেছিল। গঙ্গাচরণের তাই মনে হয়েছে, এই সব মেয়েরাই লক্ষ্মী, এরাই অন্নপূর্ণা।

গঙ্গাচরণকে গল্পের প্রথম দিকে অনেকটা স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী এবং ভড়ংদার হিসেবে আমরা পাই। কিন্তু দুঃখের পেষণে নিষ্পেষিত হতে হতে মানুষ অনেক বিবেকী হয়, সহৃদয় হয়। সাপ্লাই অফিসে পারমিট আনতে গিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে গঙ্গাচরণের পরিচয় হল। অনেকক্ষণ বন্ধ থাকার পর অফিসের জানালা যখন খুলল তখন লোকের ভিড় ছুটল সেইদিকে। সেই ভিড়ের মধ্যে গঙ্গাচরণ বৃদ্ধের হাত ধরে বললে—'শীগগির আসুন, এরপর আর জায়গা পাব না—' চরম সংকটের সময়ে মানুষ যখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে অস্থির, তখন এই পারস্পরিক সহযোগিতা মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশাবাদী করে তোলে। এও মানবতাবাদী লেখকের অপূর্ব সৃষ্টি। আর একটি অপূর্ব চরিত্র-চিত্র ক্ষেত্র কাপালীর। গঙ্গাচরণ বাজারে গিয়ে মিথ্যে করে ক্ষিদে নেই বলে খেতে না চাইলে সে বলছে—'সে হবে না ঠাকুরমশাই। আমার কাছে যা পয়সা আছে, দুজনে ভাগ করে খাই।'

পরম স্নেহময়ী জননীর মত অনঙ্গ যখন দুর্গা পণ্ডিত বা দীনু ভট্চাযকে ভোজন করাতে বসে, এমন কি নিজের ক্ষুধার অন্নও অতিথিকে ধরে দেয় তখন মনে হয়, সত্যিই সে অন্নপূর্ণা। শরৎচন্দ্রের মাতৃস্বরূপা নারীদের মত বিভূতিভূষণেরও এই অন্নদাত্রী মায়েদের ছবি অত্যন্ত প্রিয় ছবি। অন্নহারা মানুষের কাছে পরম মমতা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এ ছবি বহুভাবে এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু এই মা যখন নিঃস্ব রিক্ত জীর্ণ শীর্ণ হয়ে তার নবজাত সন্তানটিকে নিয়ে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে, তখন বড় করুণ লাগে। করুণ মনে হয়, যখন দেখি দুর্গা পণ্ডিতকেও ভিক্ষুক হয়ে নানা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়।

এই কারুণ্যের চরম প্রকাশ ঘটেছে মতি-মুচিনীর মৃত্যুদৃশ্যে। হাবুদের আমতলায় সে মরে পড়ে আছে। কিন্তু মরার আগে মতি আর এক মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে গেল। সে

অনঙ্গকে বলেছে, 'দিদিঠাকরুণ, সাত দিন ভাত খাইনি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর গেঁড়ি-গুগলি। তাও এদানি মেলে না। ভাতছালার সেই বিলির জল ঘোলা-দই। শুধু দ্যাখো মুচিপাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে-ছেলে বৌ-ঝি সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি-গুগলি ধরচে। সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। আর আধ পোয়া মাছও হয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ডাঙায় বসে কাঁদছে, ওদের মা কাঁচা গেঁড়ি-গুগলি তুলে ওদের মুখে দিয়ে কান্না থামিয়ে আবার জলে নেমেচে। কত মরে গেল ওইসব খেয়ে। নেতু বুনোর ছোট মেয়েটা তো ধড়ফড় করে মরে গেল পেটের অসুখে।'

মতি-মুচিনীর মৃত্যুই এ গ্রামে প্রথম অনাহারে মৃত্যু। তার মৃত্যুতে সারা গ্রাম থমথন করছে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তাদেরও এই পরিণতি হতে পারে! কাজেই এ গ্রামে থাকা আর নিরাপদ নয়। কিন্তু মতির প্রাণহীন দেহটার কী হবে! অচ্ছুত বলে উচ্চবর্ণের মানুষরা কেউ তার দেহ ছুঁতে চাইছে না। কিন্তু অনঙ্গ-বৌ তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে। মতি তাকে যে খুব ভালবাসত! বিভূতিভূষণ বলছেন—'হৃদয় সকলের থাকে না যার থাকে তার আনন্দও যত, কষ্টও তত।' শেষ পর্যন্ত অনঙ্গ'র অনুরোধেই কাপালী-বৌ, দুর্গা ভট্চায, গঙ্গাচরণ হাত লাগালো। তারা মতির দেহ সৎকার করার জন্য বয়ে নিয়ে চলল। শূদ্রের শব ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে মিলেই বইতে লাগল। মৃত্যু এসে সব উঁচু নীচু সমান করে দিল। মন্বন্তর এসে ঘটিয়ে দিল কালান্তর, মানুষের নব জন্মান্তর। এ ছবি করুণ, কিন্তু মহান্, শ্রদ্ধেয়।

জীবনশিল্পী বিভূতিভূষণ হৃদয়রঙে রাঙিয়ে এ ছবি এঁকেছেন। এ ছবি প্রাণস্পর্শী, কিন্তু বাস্তব! প্রয়োজনে উপমা প্রয়োগ করেছেন, বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কোথাও অতিরঞ্জন নেই, আতিশয্য নেই। অশনি-সংকেত উপন্যাসে মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে প্রতিভাসিত হয়ে আছে বিচিত্র মানবহৃদয়।